বাংলাদেশের শিক্ষার বর্তমান হালচাল

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক, ১৪ অক্টোবর ২০১৪

শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনিভাবে শিক্ষাহীন জাতিও শক্ত ভীতের ওপর দাঁড়াতে বা সাচ্ছন্দে সামনে এগুতে পারে না। তাই প্রত্যেক জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যই যথাযথ ও মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অপরিহার্য। অনেকে বলে থাকেন কোনো জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট।

বাংলাদেশের বিরাজমান শিক্ষাব্যবস্থার উৎপত্তি মূলত বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে। প্রাক-বিটিশ আমলে এদেশের শিক্ষা ছিল টোল-চতুষ্পাঠী ও মক্তব-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক। মূলত হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন ও আচার-অনুষ্ঠান এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদানই ছিল এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য এর পাশাপাশি ছিল পাঠশালা; যেখানে লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখার একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধারাও অব্যাহত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসক বৃটিশরাও প্রথমে ধর্মীয় শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখাসহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাখা এবং পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত না করে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার আকাঙ্ক্ষাই এর পেছনে কাজ করেছে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ সালে জোনাথন ডানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা, প্রথম যুগে ইংরেজদের শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তার ইঙ্গিত বহন করে। পরবর্তীকালে গঠিত প্রথম পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটি কর্তৃক এদেশবাসীকে এদেশেরই বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করে টোল, চতুষ্পাঠী, মক্তব, মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ খোলাসহ এগুলোকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের সুপারিশ করা হয়। এর প্রবল বিরোধিতা করেন রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরসহ উচ্চশিক্ষিত হিন্দু জমিদার ও উচ্চপদে আসীন কর্তাব্যক্তিরা। তাদের বাধা উপেক্ষা করেও ১৮২৪ সালে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ একের পর এক নতুন নতুন মাদ্রাসা, টোল, পাঠশালা, সাংস্কৃত কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কতিপয় হিন্দু জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে তাদের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। এই হিন্দু কলেজই ছিল পাশ্চাত্য ধারার পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যা ১৮৫৫ সালে নাম ধারণ করে প্রেসিডেন্সি কলেজ। গতানুগতিক 'ধর্মীয় শিক্ষা' নাকি 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদী শিক্ষা'– এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এদেশের ক্ষুদ্র শিক্ষিত গোষ্ঠী। এই বিরোধের অবসান ঘটে ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটির সভাপতি লর্ড মেকলে কর্তৃক গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে প্রদত্ত শিক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে। একই বছরের মার্চ মাসে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক মেকলে প্রদত্ত প্রতিবেদনটি গ্রহণ করা হয় এবং এদেশে সরকারিভাবে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'বৃটিশদের সৃষ্ট ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল, একদল আমলা ও কেরানী তৈরি করা'। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম তাঁর 'শিক্ষাভাবনা' গ্রন্থের 'আমাদের শিক্ষানীতি : অতীত ও বর্তমান' নিবন্ধে বলেছেন– ''শিক্ষার দুটি লক্ষ্য থাকে। একটি নিম্নতর এবং অন্যটি উচ্চতর। নিম্নতর লক্ষ্য হল স্থূল, ব্যবহারিক, জীবিকা অর্জনের লক্ষ্য। উচ্চতর লক্ষ্য শিক্ষার সংস্কৃতিগত দিক, আদর্শের দিক। প্রথম লক্ষ্যটি যেমন মানুষকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহ যোগায়, দ্বিতীয় লক্ষ্যটি তেমনি তার সাংস্কৃতিক মান, চিন্তার মান উন্নততর স্তরের দিকে প্রবাহিত করে। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির কোন বিরোধ নেই। একটি অন্যটির পরিপুরক। বরং দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটলে সে শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। আবার একটিকে বাদ দিলে অন্যটি নিরর্থক; বিড়ম্বিত শিক্ষাব্যবস্থা। বৃটিশ প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা তাই বিড়ম্বিত শিক্ষাব্যবস্থা। কেননা, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় এইটেই স্বাভাবিক যে, সেখানে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটাই থাকবে, উচ্চতর কোন লক্ষ্য থাকবে না। কেরানি-কর্মচারি থাকবে, মানুষের মত মানুষ থাকবে না। আমাদের শিক্ষা মূলত ঔপনিবেশিক শিক্ষা। তার কাছে ডিগ্রীর চরম লক্ষ্য চাকরি।"

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বৃটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগের ৬৬ বছর পরেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক কোনো সংস্কার হয়নি। অবশ্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে শাসকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে মাঝে মাঝেই বাঁক পরিবর্তিত হয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। পাকিস্তান আমলে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাবে শিক্ষার সেই পশ্চাদমুখী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শটি ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের সমগ্র শিক্ষাকাঠামোকে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পথ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ড. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। কুদরত-এ-খুদা কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করা হয়। খুদা কমিশনের সুপারিশসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়নের পূর্বেই ৭৫'র রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পুনরায় ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে এই ধারা আরও শক্ত-পোক্ত হয়। এভাবেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গতি প্রকৃতিও।

সর্বশেষ প্রণীত আমাদের 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০'-এর *শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য* অংশের ভূমিকায় বলা হয়েছে– 'শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।' আমাদের প্রশ্ন, আমরা কি উপরোল্লিখিত *উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য* অর্জনে যথাযথভাবে এগুচ্ছি? জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ কি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে? এই শিক্ষানীতি কি জাতিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথেষ্ট?

শুধুমাত্র আইন-কানুন বা নীতি-কাঠামোই একটি জাতির এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ। আমরা জানি, আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো আইন আছে, যার প্রয়োগ নেই। অনেক সুন্দর সুন্দর নিয়ম-নীতি আছে, যার বাস্তবায়ন নেই। আর আইন-কানুন বা নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ বা এগুলোর চর্চাগত সীমাবদ্ধতার কারণে জাতিগতভাবে পদে পদে আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাও এর বাইরে নয়।

আমরা জানি যে, বাংলাদেশের শিক্ষার বর্তমান হালচাল সাম্প্রতিককালের ব্যাপক আলোচিত একটি বিষয়। বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষা সচেতন নাগরিক এমনকি অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। এমনি এক প্রেক্ষাপটেই আমাদের আজকের এই গোলটেবিল বৈঠক।

সকল উদ্বেগ, সকল প্রশ্ন এবং সকল ভাবনাকে মাথায় নিয়েই আমরা বাংলাদেশের শিক্ষার চালচিত্রের দিকে দৃষ্টি দেব:

পরীক্ষার ফলাফলের উর্ধ্বগতি ও শিক্ষার মান:

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার উত্তরোত্তর সাফল্যের ধারা জাতিগতভাবে আমাদের জন্য যেমন স্বস্তিদায়ক, তেমনি হতাশাজনক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল। একইসঙ্গে ফলাফলের এই উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী প্রবণতায় প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার মান নিয়ে। সবচেয়ে ভালো ফলাফলের অধিকারী (জিপিএ ৫) শিক্ষার্থীর সংখ্যা গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার হারও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। নিম্নের তথ্যসমূহের দিকে চোখ বুলালেই একটি বিষয় পরিস্কার হবে যে, পাসের হার বাড়লেও, বাড়েনি শিক্ষার মান।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পাবলিক পরীক্ষা ও ঢাবি'র ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার:

নং	সাল	এসএসসি ও সমমান			এইচএসসি ও সমমান			২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার (শতকরা)
		পাসের হার (শতকরা)	জিপিএ ৫ (জন)	মোট পরীক্ষার্থী	পাসের হার (শতকরা)	জিপিএ ৫ (জন)	মোট পরীক্ষার্থী	
১.	২০০৯	৭০.৮৯	৬২,৩০৭	১০,৫৮,৬৭৪	৭২.৭৮	২০,১৩৬	৬,১৮,৩০৮	৪৬.০০ (শুধুমাত্র ক ইউনিটে)
২.	২০১০	৭৯.৯৮	৮২,৯৬১	১২,০০,৯৭৫	৭৪.২৮	২৮,৬৭১	৭,১৮,০৮৪	৪৫.০৪ (শুধুমাত্র ক ইউনিটে)
৩.	২০১১	৮২.৩১	৭৬,৭৪৯	১৩,০৭,১৫৫	৭৫.০৮	৩৯,৭৬৯	৭,৬৪,৮২৮	১৯.০০ (ক, খ, গ, ঘ ও চ ইউনিটের মোট গড়)
৪.	২০১২	৮৬.৩৭	৮২,২১২ জন	১৪,১২,৩৭৯	৭৮.৬৭	৬১,১৬২	৯,১৭,৬৭৩	১৭.০০ (ক, খ, গ, ঘ ও চ ইউনিটের মোট গড়)
৫.	২০১৩	৮৯.০৩	৯১,২২৬	১২,৯৭,০৩৪	৭৪.৩০	৫৮,১৯৭	১০,১২,৫৮১	১৯.০০ (ক, খ, গ, ঘ ও চ ইউনিটের মোট গড়)
৬.	২০১৪	৯১.৩৪	১,৪২, ২৭৬	১৪,২৬,৯২৩	৭৮.৩৩	৭০,৬০২	১১,৪১,৩৭৪	১৪.২৬ (ক, খ, গ, ঘ ও চ ইউনিটের মোট গড়)

তথ্যসূত্র: গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে নেওয়া।

চারদলীয় জোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পাবলিক পরীক্ষা ও ঢাবি'র ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার:

নং	সাল	এসএসসি ও সমমান			এইচএসসি ও সমমান			
		পাসের হার (শতকরা)	জিপিএ ৫ (জন)	মোট পরীক্ষার্থী	পাসের হার (শতকরা)	জিপিএ ৫ (জন)	মোট পরীক্ষার্থী	
১.	২০০১	৩৫.২২	৭৬	৭,৮৬,২২০	২৮.৪১			
২.	২০০২	৪০.৬৬	৩২৭		২৭.০৯			
৩.	২০০৩	৩৫.৯১	১,৩৮৯		৩৮.৪৩			
৪.	২০০৪	৬০.২৭	৮,৫৯৭		৪৭.৭৪			
৫.	২০০৫	৫৪.০১	১৫,৬৩১	৯,৪৪,০১৫	৫৯.১৬			
৬.	২০০৬	৬২.২২	৩০,৪৯০	৯,৯৫,১২৩	৬৫.৬৫	৯,৮৬৪	৫,১০,৯৪৯	
৭.	২০০৭	৫৮.৩৬	৩২,০৬০	১০,২৪,৫৩৭	৬৫.৬০	১১,১৪০		
৮.	২০০৮	৭২.১৮	৫২,৫০০	১০,০৬,৫৬৯	৭৬.১৯	২২,০৪৫	৬,১২,৮১	

তবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দাবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষামন্ত্রীর এ বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে সরকারি ভাষ্য যাই হোক না কেন, জনমনে এমন একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে, কৃত্রিমভাবে পাশের হার বাড়ানো হয়েছে। অনেকেই দাবি হলো– শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। সরকার শিক্ষাখাতে তার সফল্য দেখাতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল ভালো দেখাতে চায় বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে রংপুরে সুজন আয়োজিত এক নাগরিক সংলাপে জনৈক শিক্ষক জানান যে, পরীক্ষকদেরকে নাকি এভাবেও নির্দেশনা দেয়া হয়– ' আন্ডার মার্কিং কখনও নয়, ওভার মার্কিং দোষের নয়'। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন টেলিভিশন টকশোতে আলোচনাসহ পত্র-পত্রিকাতেও প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এমন হয়, তা কি জাতির ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে?

উল্লেখ্য, শিক্ষার মানোন্নয়ন না হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে কোচিং বাণিজ্য, গাইড বই নির্ভরতা ও মুখস্থ বিদ্যার প্রাধান্যকেও দায়ী করেন।

নতুন উদ্বেগ: প্রশ্নপত্র ফাঁস

সাম্প্রতিক সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নপ্রত্র ফাঁসের ঘটনা নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। এটি যেন একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ১১ এপ্রিল ২০১৪ *সকালের খবর* পত্রিকায় 'দুই বছরে ১৩ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়– 'কুষ্টিয়ায় চলতি বছরের এসএসসির গণিত প্রশ্ন, গত ২৮ মার্চ লালমনিরহাটে স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন, গত বছরের নভেম্বরে প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার প্রশ্ন, একই বছরের ৮ নভেম্বর প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার, ৩০ মে চট্টগ্রামে এইচএসসি পরীক্ষার, ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয় পত্র, গণিত এবং ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্ন, ৩১ মে অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ পরীক্ষার, ইসলামী ব্যাংকের প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ পরীক্ষার, ২০১২ সালের ৭ অক্টোবর ৩৩তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সব প্রশ্ন, ওই বছরের ৩ আগস্ট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ পরীক্ষার এবং ২১ সেপ্টেম্বর সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। সর্বশেষ গতকাল ঢাকা বোর্ডের এইচএসসির ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়।'

প্রশ্নপত্র ফাঁসের এ ধারা চলতে থাকলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা নিয়মমতো পড়াশুনা করে, তারা পড়াশুনায় উৎসাহ হারাবে। প্রশ্ন হচ্ছে– আমরা কি শিশু পরীক্ষার্থীদের মানসিক হয়রানির মধ্যে রাখবো এবং শিশু বয়সেই রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে দুর্নীতি শিখতে উৎসাহিত করবো? নিশ্চয়ই না।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠার কারণ হলো– সরকারের পক্ষ থেকে প্রশ্নপ্রত্র ফাঁসের দায় স্বীকার না করে অভিযোগ অস্বীকার করা এবং দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়া। গত ২৬ জুন ২০১৪ তারিখে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত পাঁচ বছরে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁস গুরুতর একটি ফৌজদারি অপরাধ। এই অপরাধবৃত্তি কেন ও কীভাবে পরীক্ষাব্যবস্থার ভেতরে একটা দূরারোগ্য ব্যাধির মতো হয়ে উঠল, তা উদ্‌ঘাটন করা জরুরি। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরীক্ষার হলে পৌঁছানো পর্যন্ত এর পরিপূর্ণ গোপনীয়তা-সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাদের, তাদের কি কোনোই জবাবদিহিতা নেই?

উল্লেখ্য, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে অতীতে অনেকবার অনেক কোচিং সেন্টারের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা:

বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথমে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল– বর্ধিত ও অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্রদের জন্য মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং আশির দশকে সৃষ্ট সেশনজট পর্যায়ক্রমে কাটিয়ে উঠা। সরকারি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকের ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বজায় রাখার প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে গণহারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়, যেগুলোর প্রয়োজনীয় নির্মাণ অবকাঠামো, আর্থিক সঙ্গতি ও সবল শিক্ষানুষঙ্গ বিবেচনায় আনা হয়নি। প্রস্তাবকারীদের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বিষয়গুলো উপেক্ষা করা হয়। অন্যদিকে, গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানও পর্যায়ক্রমে নেমে এসেছে।

খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন-ইউজিসি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে (২০১২) বলা হয়েছে– দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা বিরাজ করছে। কী শিক্ষার মান, পরীক্ষা পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা আর সুশাসন – সব ক্ষেত্রেই এই একই পরিস্থিতি। আর এ কারণে এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। যে কারণে সম্মিলিতভাবে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে স্নাতকদের ওপর (*মানবজমিন*, ১৩ জানুয়ারি ২০১৪)।

গত ৩০ জুন ২০১৪ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) *'বিশ্ববিদ্যালয় : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়'* শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। গবেষণাপত্রটি বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র উঠে আসে তা হলো:

- এ পর্যন্ত সরকার ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে। যদিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার অনুমোদন দিয়ে থাকে, কিন্তু শুরু থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রতিষ্ঠাতা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাই বিগত সাত বছর ধরে লাভের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। আইনের ফাঁক দিয়ে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে কীভাবে অর্থ লাভ নেওয়া যায় তার নানা অপকৌশল চর্চা করেছেন।
- অনিয়ম, দুর্নীতি রোধকল্পে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' কার্যকরী করার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সার্টিফিকেট বাণিজ্যকে বরং শিক্ষা মন্ত্রণালয় নানাভাবে সহযোগিতা করছে। বিগত পাঁচ বছর ধরে দশ বারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বাণিজ্য প্রায় প্রকাশ্যে করছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।
- শিক্ষক নিয়োগে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা পাওয়া যায়নি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগে নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম অনেকেই মেনে চলছে না। ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হচ্ছে ১:২৬। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার আছে যথাক্রমে ৫২টি, ১৮টি ও ৩০টিতে।
- গবেষণার পর্যবেক্ষণে সার্বিকভাবে এ সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা, অস্পষ্টতা এবং বিধিমালার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অলাভজনক খাত হওয়া সত্ত্বেও মুনাফাভিত্তিক খাতে পরিণত; বোর্ড অব ট্রাস্টিজের একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সুযোগ; ভিসি/প্রো-ভিসি/সিন্ডিকেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলংকারিক/বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নামমাত্র ভূমিকা; স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, তদারকি ও সমন্বয়হীনতার অভাবে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতির উদ্ভব ও প্রসার; কার্যতঃ মুনাফাভিত্তিকে পরিণত হওয়ায় ট্রাস্টিবোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব, ক্যাম্পাস দখল ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট; উদ্যোক্তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে তদারকি/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্ব; শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অপর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় সুষ্ঠু তদারকির অভাব; অনুমোদনসহ ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক প্রভাব; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতির উদ্ভব ঘটেছে।

উল্লেখ্য, টিআইবি'র প্রতিবেদনটিকে 'ভিত্তিহীন ও অনুমান নির্ভর' আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। অগ্রসরমান বেসরকারি উচ্চশিক্ষা খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে টিআইবি এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এর জবাবে টিআইবি'র পক্ষ থেকে বলা হয়– গবেষণালব্ধ তথ্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান না করে বাস্তবতার নিরিখে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমেই উচ্চশিক্ষা খাতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব।

আমরা মনে করি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করতে হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুসরণ করার পাশাপাশি টিআইবি'র গবেষণায় উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খাতে বিরাজমান দুর্নীতি-অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দঃ

জাতিগতভাবে আমরা শিক্ষা খাতকে কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিচ্ছি, তার প্রতিফলন দেখা যায় এই খাতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে সামগ্রিকভাবে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমেছে ২.৮৯ শতাংশ। আর গত পাঁচ বছরে সামগ্রিকভাবে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে জিডিপির অনুপাতে বরাদ্দ কমেছে ০.১৬ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে শিক্ষা খাতে একটি দেশের মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ছয় শতাংশ বা মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। ওই পরিমাণ বরাদ্দ দিতে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানীতে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সম্মতিতে স্বাক্ষর হয় "ডাকার ঘোষণা"। স্বাক্ষরিত বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। চলতি অর্থবছরে (২০১৪-১৫) আমাদের শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ১১.৬৬ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় আয়ের অনুপাতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২.১৮ ভাগ। যা এডিপির অনুপাতে ১১.৭ শতাংশ। অথচ অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের চেয়ে অসচ্ছল হলেও আফ্রিকার তানজানিয়ায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয় মোট বাজেটের ২৬ শতাংশ। আর লেসোথোয় এ বরাদ্দ ২৪ শতাংশ, বুরুন্ডিতে ২২, টোগোয় ১৭ ও উগান্ডায় ১৬ শতাংশ।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য ছকে প্রদত্ত হলো–

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের হারঃ

নং	অর্থবছর	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বরাদ্দের শতকরা হার
১.	২০১১-১২	১৯,৮৩৭	১২.৪
২.	২০১২-১৩	২১,৪০৮	১১.৫
৩.	২০১৩-১৪	২৫,১১৪	১১.৩
৪.	২০১৪-১৫	২৯,২১৩	১১.৬৬

তথ্যসূত্রঃ বিভিন্ন অর্থবছরের জাতীয় বাজেট।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ (জিডিপির %)ঃ

নং	দেশের নাম	বরাদ্দের শতকরা হার	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশ	২.৩	
২.	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫.৭	
৩.	চীন	৪.৩	
৪.	কিউবা	১৮.৭	
৫.	মালদ্বীপ	৭.৫	

আমাদের সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা নাগরিকদের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। সচেতন নাগরিকরা মনে করেন, শিক্ষাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এখন সময়ের দাবি। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি শিক্ষার এই সুযোগকে অধিকারে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

ভর্তির হার বাড়লেও কমছে না ঝরে পড়ার হারঃ

১৯৯০ সালে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। পরবর্তী সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া বিভিন পদক্ষেপের কারণে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার দাঁড়ায় প্রায় শতভাগ। ভর্তির এই উচ্চ হার আশাব্যঞ্জক হতে পারতো যদি ঝরে পড়ার হার কম হতো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ মাঠ সমীক্ষা প্রতিবেদনে অনুযায়ী, ২০১৩ সালে প্রাথমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৯৭ দশমিক ৩ শতাংশ। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ঝরে পড়ার হার ছিল ২১ দশমিক ৭ শতাংশ। এখানেই শেষ নয়, মাধ্যমিকে যারা ভর্তি হয়,

তাদের মধ্যে আবার ৪৩ শতাংশেরও বেশি ঝরে পড়ছে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির বিবেচনায় এসএসসি পাস করছে মাত্র ২৬ শতাংশ। আবার এদের মধ্যে মাত্র ৪৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ ভর্তি হয় একাদশ শ্রেণীতে। সমীক্ষা বলছে– বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে প্রায় ১ কোটি ৯৬ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। এর বিপরীতে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে প্রায় ১১ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষার্থী। এই হিসাবে এইচএসসি পর্যন্ত মাত্র সাড়ে ৫ ভাগ শিক্ষার্থী টিকে থাকছে। বাকি সাড়ে ৯৪ ভাগ শিক্ষার্থীই ঝরে পড়ছে (*যুগান্তর*, ০১ অক্টোবর, ২০১৪)।

বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে (মার্চ ২০১৪) ঝরে পড়ার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক বলেছে, মূলত দারিদ্র্যের কারণেই বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ। এছাড়া দুর্বল শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের দুর্বল ভিত্তিসহ নানা কারণে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের এভাবে ঝরে পড়ার ঘটনা ঘটে থাকে। আমরা মনে করি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা না গেলে জাতিগতভাবে আমরা পিছিয়ে পড়বো, থমকে যাবে আমাদের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন।

শিক্ষকদের অপ্রতুল বেতন-ভাতা এবং টিউশনি ও কোচিং বাণিজ্য:

উন্নত বিশ্বে শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেই নয়, আর্থিক দিক থেকেও সমাজে শিক্ষকদের শীর্ষত্ব বজায় রাখা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা শিক্ষকদের আর্থিক দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে পারিনি। ফলে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনে অনেক শিক্ষকই নির্ভর করেন অন্য কোনো পেশার ওপর। আর এই অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করার জন্য আমাদের দেশের শিক্ষকদের সিংহভাগই জড়িয়ে পড়ছেন প্রাইভেট ও টিউশনির সাথে। অনেকে জড়িয়ে পড়ছেন কোচিং ব্যবসার সাথে। এখন প্রাইভেট, টিউশনি বা কোচিং ব্যবসার সাথে জড়িত শিক্ষকরা 'ব্যবয়ায়িক সাফল্যের' দিকটি বিবেচনায় নিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে উৎসাহবোধ করেন না। ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব গিয়ে পড়ে শিক্ষার মানের ওপর।

শিক্ষক রাজনীতি ও আদর্শনিষ্ঠায় ক্রমাবনতি:

শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। দলীয় রাজনীতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক সম্মানিত শিক্ষকের বিরুদ্ধেই নিয়মিত ক্লাস না করানোর অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদের অনেককেই এখন নিজেদের দায়িত্বের চেয়ে দলীয় মুখপাত্রের মত টকশোতে মতামত ব্যক্ত করাসহ কলাম লেখায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। চলমান ভোগবাদী রাজনীতির ধারায় গা ভাসানো এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তির কারণে অনেকেই শিক্ষক হিসেবে তাদের উচ্চ আদর্শ বা নীতিনিষ্ঠতাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কেউ কেউ দ্রুত অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিচ্ছেন। সম্মানিত শিক্ষকদের একাংশের এই ধরনের কৃতকর্মের প্রভাব পড়ছে শিক্ষার মানের ওপর।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের গণহারে ছুটি প্রদান, বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শক হিসেবে কাজ করা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পাঠদান ইত্যাদি বিষয়সমূহও শিক্ষাক্ষেত্রের বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব:

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার একটি বড় কারণ লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি। বড় বড় রাজনৈতিক দলের লেজুড় ছাত্র-সংগঠনগুলোর মধ্যে কোনো আদর্শিক চিন্তাভাবনা পরিলক্ষিত হয় না। এই ধারার ছাত্র রাজনীতি এখন ছাত্র-ছাত্রী বা দেশ-জাতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারছে না। এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এখন চাঁদাবাজী-টেন্ডারবাজীতে অর্থাৎ অর্থবিত্তের নেশায় মশগুল। সন্ত্রাস, ভর্তি বাণিজ্য, সিট বাণিজ্য এগুলোই যেন তাদের নিত্যদিনের কাজ। এসকল কাজের মালিকানা তথা আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মাঝে মাঝেই তারা লিপ্ত হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। আগে প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনগুলো পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও এখন একই সংগঠনের বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের লেজুড় ছাত্রসংগঠনের বিভিন্ন গ্রুপকে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এতে অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তৈরি হয় সেশান জট। ভর্তি বাণিজ্য-সিট বাণিজ্য ইত্যাদির কারণে গ্রামগঞ্জের অনেক সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থী জড়িয়ে পড়ে আত্মঘাতী এই ছাত্র রাজনীতিতে। শোনা যায় যে, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসগুলো এখন নাকি আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে নেই।

লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতির বিপরীতে সুস্থধারার ছাত্ররাজনীতির ধারাটি এখন যথেষ্ট দুর্বল। তদুপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে নেতৃত্ব বিকাশের পথটি অনেকাংশেই রুদ্ধ।

এক্ষেত্রে সুস্থ ধারার ছাত্ররাজনীতির সরব উপস্থিতিই পারে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে শিক্ষাক্ষেত্রকে রক্ষা করতে।

শিক্ষানীতি, শিক্ষা আন্দোলন ও পণ্যে রূপান্তরিত শিক্ষা:

১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পর থেকে আমরা অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন দেখেছি। দেখেছি দেশ কাঁপানো দুটি শিক্ষা আন্দোলন। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখি ১৯৬২ সালে শরীফ শিক্ষা নীতি বিরোধী আন্দোলনে ওয়াজিউল্লাহ, বাবুল, মোস্তফা এবং ১৯৮৩ সালে মজিদ খানের শিক্ষা নীতি বিরোধী আন্দোলনে জাফর, জয়নাল, মোজাম্মেল, কাঞ্চন ও দিপালী সাহাকে শহীদ হতে। এই শিক্ষা আন্দোলনগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো– শিক্ষা যেন কোনোভাবেই পণ্যে পরিণত না হয়, একটি অভিন্ন পদ্ধতির আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি যাতে প্রণীত হয়, শিক্ষার ব্যয়ভার যেন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে ইত্যাদি। আমরা যে অবস্থা বর্তমানে দেখছি তাতে শিক্ষা অতিমাত্রায় পণ্যে পরিণত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই শিক্ষার ব্যয়ভার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠীরই নয়, নিু মধ্যবিত্তদেরও নাগালের বাইরে। উল্লেখ্য, এবছর শান্তিতে যৌথভাবে নোবেল জয়ী ভারতের শিশু অধিকার সংগঠক কৈলাস সত্যার্থী গত ১২ অক্টোবর *প্রথম আলো*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত না করে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে তিনি শিক্ষার দায়িত্ব অন্য কারো ওপর অর্পণ না করে মৌলিক অধিকার হিসেবে রাষ্ট্রকে এর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা অসংগত নয় যে, সাম্প্রতিককালে একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, কোনো কোনো আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন; যা বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন কোর্সসমূহও শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণের এক ধরনের প্রবণতা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

আর শিক্ষাপদ্ধতির দিকে তাকালে দেখা যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত। ব্যাপকতার দিক থেকে চিন্তা করলে এখনও বাংলা মাধ্যমের সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। রাজধানী ঢাকা ও বড় বড় শহরগুলোকে বাদ দিলে বাংলা মাধ্যমের সাধারণ শিক্ষা এখন পর্যন্ত মূল ধারা। মাদ্রাসা শিক্ষারও ব্যাপকতা রয়েছে সারাদেশে। মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি আবার দুই ধরনের: ক) আলিয়া মাদ্রাসা ও খ) কওমী মাদ্রাসা। আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে সরকারের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকলেও, কওমী মাদ্রাসাসমূহ সম্পূর্ণরূপে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাই মূল ধারায় পরিণত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন পদ্ধতির এই শিক্ষাধারা অতীতের শিক্ষা আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্যের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

উল্লেখ্য, বাংলা মাধ্যমের সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি সরকারের কাছে কতটা অবহেলিত, তা ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি দখল হয়ে যাওয়ার খবর সংবাদপত্রে দেখেই বুঝা যায়। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ *সমকালে* প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ঢাকার মোট ২৯৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৪টির জমি দখল করা হয়েছে।

বিজ্ঞানশিক্ষায় ধ্বস:

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে যারা যত এগিয়ে অগ্রগতির ক্ষেত্রেও তারা তত দ্রুতগামী। তাই বলা হয়ে থাকে একটি জাতির সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার উপর। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা আশংকাজনকভাবে পিছিয়ে পড়ছি। Bangladesh Freedom Foundation (BFF)-এর গবেষণামতে ১৯৮৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের হার ছিল ৪১.৩৫%। ২০০৮ সালে এই হার দাঁড়ায় ২৩.৭৬%-এ। Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS)-এর গবেষণা অনুযায়ী ২০০১ সালে ৭,৮৬,২২০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২,৬৪,১০০ জন ছিল বিজ্ঞান বিভাগের, যা মোট শিক্ষার্থীর ৩৩.৫৯%। ২০১০ সালে সর্বমোট ৯,১২,৫৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ২,০৩,৯৯২ জন, যা মোট শিক্ষার্থীর ২২.৩৫%। অর্থাৎ এক দশকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ১১.২৪%। একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও। ২০০১ সালে ৫,২৫,৭৫৫ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১,২৬,৩১৫ জন ছিল বিজ্ঞান বিভাগের, যা মোট শিক্ষার্থীর ২৪.০৩%। ২০১০ সালে সর্বমোট ৫,৮০,৬২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ১,০৬,৫২৭ জন, যা মোট শিক্ষার্থীর ১৮.৩৫%। অর্থাৎ এক দশকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর হার কমেছে ৫.৬৮%। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে ২০০৯ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর হার ছিল ১৪.৫%। ২০১৩ সালে এই হার গিয়ে দাঁড়ায় ১৩.৩%-এ, এখন যা মাত্র ১২%।

আশংকাজনকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী হ্রাসের এই হার রোধ করা না গেলে, জাতিগতভাবে ভবিষ্যতে আমাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে।

নিয়োগ বাণিজ্য ও শিক্ষার রাজনীতিকীকরণঃ

শিক্ষার মানোন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ। কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসমূহের নিয়োগ বাণিজ্যের কারণে প্রকৃত মেধাবীরা অনেক ক্ষেত্রেই নিয়োগ পান না। এ ধারা প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিদ্যমান। ফলে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়।

আর স্থানীয় পর্যায়ের স্কুল-কলেজ পরিচালনায় মাননীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা এখন সর্বজনবিদিত। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে কলেজ-বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা পরিষদ নিজের মত করে সাজাতে চান। এক্ষেত্রে অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, এক বিদ্যালয়ের পিয়নকে মাননীয় সংসদ সদস্যর প্রতিনিধি হিসেবে অন্য বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদে মনোনীত করারও খবরও গণমাধ্যমে দেখা যায়।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগসহ শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ও অন্যান্য দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্যই এখন অন্যতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও ইতিবাচক দিকসমূহঃ

পাকিস্তান আমল থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ অনেকবার গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৫৮ সালে এস এম শরীফের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৮ সালে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯৮২ সালে শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল মজিদ খানের নেতৃত্বাধীন শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ, ১৯৮৭ সালে উপাচার্য মফিজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ২০০৪ সালে ড. মনিরুজ্জামানের মিঞার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন এবং ২০০৯ সালে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে আমরা দেখতে পাই। অতীতের ৮ টি উদ্যোগ সফলতার মুখ না দেখলেও সর্বশেষ গঠিত অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ উপহার দেয়; যার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই শিক্ষানীতিতে সর্বমোট ২৮টি অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে: শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য; প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা; বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা; মাধ্যমিক শিক্ষা; বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা; মাদ্‌রাসাশিক্ষা; ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা; উচ্চশিক্ষা; প্রকৌশলশিক্ষা; চিকিৎসা; সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা; বিজ্ঞানশিক্ষা; তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা; ব্যবসায়শিক্ষা; কৃষিশিক্ষা; আইনশিক্ষা; নারীশিক্ষা; কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা; বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী; ক্রীড়াশিক্ষা; গ্রন্থাগার; পরীক্ষা ও মূল্যায়ন; শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা; শিক্ষার্থী ভর্তি; শিক্ষক প্রশিক্ষণ; শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব; শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক; শিক্ষা প্রশাসন এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ।

আমরা মনে করি, জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার পুরোপুরি প্রতিফলন না ঘটলেও এই শিক্ষানীতিতে অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে।

যেমন:

- শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা'র বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করা।
- একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে মনে রেখে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করার বিষয়টি শিক্ষানীতিতে সন্নিবেশিত করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩০ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা।
- নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা এবং বিশেষ বরাদ্দের ধারা অব্যাহত রাখা।
- মুখস্থ বিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করা ও সৃজনশীল মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোকে নতুন করে বিন্যস্ত করা (প্রাথমিক শিক্ষা: প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং মাধ্যমিক শিক্ষা: নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা কারিকুলামের আওতায় আনা।

- আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দেশ-বিদেশের চাহিদার কথা মনে রেখে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করা।
- নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে দুই বছরের পাঠক্রমে 'জেন্ডার স্টাডিজ ও প্রজনন স্বাস্থ্য' বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি।

শিক্ষানীতির বিষয়সমূহ ছাড়াও বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া, পরীক্ষার ফলাফল দ্রুততার সঙ্গে ঘোষণা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্রুত শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে সরকারের সাফল্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

সুজন-এর সুপারিশঃ

বিরাজমান শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাসমূহ কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের অনেক করণীয় রয়েছে; যা সুপারিশ আকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নতুনভাবে বিন্যাসিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতি অবিলম্বে চালু করা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিন্ন শিক্ষা পাঠক্রম শুরু করা।
- বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণার ভিত্তিতে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রেখে ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা।
- বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাববকদের সচেতন করা, বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি (যেমন-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিজ্ঞান মেলার আয়োজন) গ্রহণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- প্রাইভেট-টিউশনিসহ কোচিং বাণিজ্য বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- গাইড বই নিষিদ্ধকরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান করে নতুন করে আইন করা এবং যথাযথভাবে তা প্রয়োগ করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের মনিটরিং প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা।
- জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২৫% শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা।
- গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং জনস্বার্থে নতুন নতুন উদ্ভাবনকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।
- নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রকৃত মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া।
- লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ'-এ বর্ণিত এসংক্রান্ত বিধি-বিধান কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।
- চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি বাণিজ্য ও সিট বাণিজ্য ইত্যাদিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা এবং তা সংবিধানে সন্নিবেশিত করা।
- অভিযোগের দায় এড়ানোর সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে (যেমন– প্রশ্নপত্র ফাঁস, অতিমূল্যায়িত ফলাফল ইত্যাদি) বেরিয়ে আসা।
- রাজধানীতে বেদখল হয়ে যাওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জমি অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করা।
- ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সকল ধর্মের (বিশেষ করে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান) মৌলিক বিষয়সমূহসহ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহাবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বোর্ড পরীক্ষা পদ্ধতির ধারা থেকে পর্যায়ক্রমে বেরিয়ে আসা কলেজ ও বিদ্যালয়কেই এই দায়িত্ব প্রদান উদ্যোগ গ্রহণ করা।

- শুধুমাত্র নারীশিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে 'জেন্ডার স্টাডিজ ও প্রজনন স্বাস্থ্য' বিষয়কে একই পর্যায়ের ছাত্রদের পাঠদানের জন্যও নির্ধারণ করা।
- উচ্চশিক্ষাকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠন করা।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে প্রায় ৪৩ বছর পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করলেও এদেশের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ আজও পূরণ হয়নি। জাতিগতভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসাবে শিক্ষার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারার কারণে আজও আমরা বিভিন্নমুখী সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। সমস্যার এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য মুক্তবুদ্ধির চেতনায় শানিত হয়ে অসীম সাহস ও শক্তি নিয়ে শিক্ষা সংস্কারে আমাদের গ্রহণ করতে হবে বৈপ্লবিক কিছু পদক্ষেপ। যে পদক্ষেপগুলো শিক্ষা, মেধা, মনন ও সাংস্কৃতিক বোধে জাতিগতভাবে আমাদেরকে বলীয়ান করে এগিয়ে নিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত সম্মানিত অংশগ্রহণকারীগণের মতামত ও সুপারিশসমূহ প্রবন্ধটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে